Rs. 2.00
মূল্য ঃ ২ টাকা

PRABINBARTA
প্রবীণবার্তা

MONTHLY
মাসিক

Vol : IX Issue : XII, 15th, March, 2021 ফাল্গুন, ১৪২৭, বার্ষিক মূল্য-২০ টাকা RNI NO. WBBEN/2012/46375

সম্পাদকীয়

[এবারের সম্পাদকীয় লিখেছেন আমাদের শ্রদ্ধেয় সভাপতি পেলব [illegible]]

মার্চ মাস এসে গেলো। আমাদের কাছে এ সময়ের গুরুত্ব অনেকটাই। আমাদের কাছের মানুষ প্রাক্তন সভাপতি বিমল চ্যাটার্জীর মৃত্যুদিন। ১৩ মার্চ বেথুন ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠা দিবস। ২২ মার্চ শ্রদ্ধেয় কম: হরিদাস মালাকারের মৃত্যু দিন। সারা মার্চ মাস জুড়েই ইনস্টিটিউটের সবাইকেই ব্যস্ত থাকতে হয় এসব স্মরণীয় ব্যক্তিদের স্মরণ করার জন্য।

গত বছর যে বিভীষিকার মধ্য দিয়ে চলতে হয়েছে তা আর বলার নয়। ১৩ মার্চ ডা: বেথুনের জন্মদিন আর ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা গেলেও, অন্যান্য অনুষ্ঠান আমরা পালন করতে পারিনি করোনার আক্রমণে সারা দেশে সব কিছু সরকারি নির্দেশে রোগ প্রতিরোধ সংগ্রামে লিপ্ত হবার কারণে। শতাব্দির সেরা ঘটনা হলো করোনার আক্রমণ। যা আজও ঘটে চলেছে। বছর কেটে গেলেও করোনা চলছে বীর বিক্রমে, কবে এর শেষ হবে জানা নেই। এখন টিকাকরণ চলছে দেশ জুড়ে। আবার নতুন করে করোনার ঢেউ উঠছে। ৪টি প্রদেশে রোগে আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে।

করোনার আক্রমণে জনজীবন সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। স্কুল কলেজে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসেনি। আদালতও প্রায় বন্ধ। এরকম অস্বাভাবিক পরিস্থিতির মধ্যেও আমাদের চলতে হয়েছে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখবার সংগ্রামে।

আমাদের লড়াই কিন্তু থেমে থাকেনি। রিলিফ বিতরণ করেছি। প্রবীণবার্তা প্রকাশ করতে পেরেছি। সবেমাত্র ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করলেও নতুন করে আক্রমণের শিকার আমরা। এসব সত্ত্বেও ভাষা আন্দোলনের অনুষ্ঠান আর বাৎসরিক পিকনিকও অনুষ্ঠিত হয়েছে। সময় এগিয়ে যাবে, মানব সভ্যতাও এগিয়ে যাবে আপন গতিতে।

সামনে নির্বাচন। ঢাকে কাঠি পড়ছে জোরে জোরে। আপনাদের ভোটে আগামী ৫ বছরের জন্য রাজ্যর ক্ষমতা কাদের হাতে যাবে তার পরীক্ষা দিতে হবে। আপনারা জিতবেন। থেমে থাকবেন না। এগিয়ে যাবেন নিশ্চয়ই।

আপনাদের শুভেচ্ছা জানাই মার্চ মাসের অনুষ্ঠানগুলি যাতে সুচারুভাবে সম্পন্ন করতে পারি সে আবেদন রেখে। শ্রদ্ধেয় বেথুন, বিমল চ্যাটার্জী এবং হরিদাস মালাকারকে স্মরণ করে আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য প্রকাশ করলাম জয় হবেই এই প্রত্যয় নিয়ে।

ভোজনে ধর্মাধর্ম

ডাঃ মৃগেন্দ্র নাথ গাঁতাইত

খেতে খেতে টিভি দেখছিল অমল আর কঙ্কনা। স্বামী স্ত্রী। খবরে দেখাচ্ছে রাজস্থানের ছোট এক গঞ্জ এলাকায় একজন লোককে ধরে মারছে কয়েকজন লোক। কারণ, ঐ লোকটা নাকি গরুর মাংস নিয়ে যাচ্ছিল বিক্রির জন্য। খবরটা দেখে অমল বলল, কী যে হচ্ছে দেশে। কল্পনা বলল, কেন যে এদের গরুর মাংসের প্রতি এত আকর্ষণ কে জানে। ঐ সব খায় বলেই তো ওদের মেজাজ গরম, যত রকম বাজে কাজ করে।

অমলঃ এটা তুমি কী বলছ? তা কেন হবে? মানুষের খাবারের রুচি এত রকমের তা বলে শেষ করা যাবে না। সবাই কি এক খায়?

কঙ্কনাঃ আমাদের মতন গরম দেশে গরুর মাংস মোটেই ভাল নয়। ওই সব না খেলে কি খাওয়া চলে না?

অমলঃ এই যে তুমি ধনেপাতা খাও। আমরা ছোটবেলায় ধনেপাতা খেতাম না। গন্ধ লাগত। এখনো আমাদের গ্রামে এসব খায় না। কিন্তু খেতে খেতে আমিও অভ্যস্ত হয়ে গেছি। এখন বরং ভাল লাগে।

কঙ্কনাঃ ওটা তো এক ধরনের শাক। তার সঙ্গে গরুর মাংসের তুলনা হয় নাকি?

অমলঃ তুমি তো মুরগির মাংস খেতে এত পছন্দ কর। তুমি জান কিনা জানি না, আগে বনেদী হিন্দু বাড়িতে রান্নাঘরে মুরগীর মাংসের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। মা আমাদের বলত, তোরা যদি খেতে চাস তাহলে বাইরের উঠোনে পালক ছাড়িয়ে রান্না কর। এখন, আমাদের সেই বাড়িতে ফ্রীজে সবসময় চিকেন থাকে।

কঙ্কনাঃ চিকেন অনেক হাল্কা মাংস,এটা খেলে শরীরে উত্তেজনা আসবে না। কোলেস্টেরল বাড়বে না, হার্টএর রোগ হবে না।

অমলঃ যারা পুরো নিরামিশাষী তাদেরও তো হার্টের অসুখ হয়। তারা তো গোমাংসে খায় না। আসলে, খাবারে তেল, চর্বির পরিমাণ কম থাকা দরকার। গোমাংস খেলাম না, কিন্তু প্রচুর ঘি মাখন খেলাম। তাহলেও একই বিপদ হবে।

কঙ্কনাঃ সেটা ঠিক কথা। তুমি আজকাল একটু বেশি চিজ খাচ্ছ। খাওয়াটা কমাও।

অমলঃ হ্যাঁ, আমার চিজ খেতে ভাল লাগে, তবে কমাতে হবে। আচ্ছা, তোমার কলেজের বান্ধবী শোভনা মেহতা তোমাদের হোস্টেলে এসে ডাইনিং হলে গিয়ে প্রায় বমি করতে যাচ্ছিল না? তুমি অনেকবার এ গল্প আমাকে বলেছ।

কঙ্কনাঃ সে কী অবস্থা! ও তো পুরো নিরামিশাষী। আমরা ডিমের ওমলেট খাচ্ছিলাম দেখে ওর বমি পেয়ে গেল।

অমলঃ ডিম, তাতেই এই অবস্থা। মাছ বা মাংস হলে কী না কী হত কে জানে। এখানেই হয়ত মূর্ছা যেত। তাহলেই দেখ মানুষের খাদ্যাভাস, রুচি কত রকমের হয়। তোমার এই শোভনার ডিম দেখেই ঘেন্না। তুমি তাহলে ঘেন্নার খাবার খাচ্ছিলে? যারা আজ গোমাংস নিয়ে এত বাড়াবাড়ি করছে, তারা যদি এরপরে মাছ মাসে নিয়ে শুরু করে তাহলে কী হবে ভেবে দেখেছ? আমি চিকেন কিনে ফিরছি, আমাকে ধরে মারতে শুরু করল। যুক্তি হবে প্রাণী হত্যা করা যাবে না।

কঙ্কনাঃ প্রাণী হত্যা করা যাবে না এ রকম কোন ধর্ম আছে নাকি?

অমলঃ আছে তো। জৈনরা দেখবে মুখে ঢাকনা দিয়ে রাখে যাতে কোন পোকামাকড় জীব

মুখের ভিতরে ঢুকতে না পারে। ভারতে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে (তখন তো ইসলাম ধর্ম জন্মায় নি) হিন্দুরা সব প্রাণী খেত। এই জীব হত্যার বিপরীতে জৈনরা জীব হত্যা না করার রীতি গ্রহণ করে। কিন্তু জৈনরা তাদের বিশ্বাস নিয়ে থাকে, কোনো বাড়াবাড়ি করে না যে, কেউ মাছ মাংস খেতে পারবে না। আর হিন্দু ধর্মের দোহাই দিয়ে যারা গোমাংস নিয়ে এত বাড়াবাড়ি করছে তারা ভুলে গেছে যে প্রাচীনকালে মুনিঋষিরা যজ্ঞের সময় অশ্ব ইত্যাদি নানা প্রাণী আহুতি দিত। ঋগবেদে, বেদব্যাসের মহাভারতে, কালিদাসের মেঘদূতম কাব্যে হিন্দুদের গোমাংস ভক্ষণের বিশদ বিবরণ আছে। রামায়ণে অশ্বমেধ যজ্ঞের বিবরণ রয়েছে। সে সময় সোমরসের (মদ) সঙ্গে যজ্ঞের আহুতি দেওয়া প্রাণী মাংস ছিল অত্যন্ত প্রিয় আদরনীয় ভোজ। বিবেকানন্দের রচনাবলী পড়লে দেখবে লেখা আছে, আগে এক সময় ছিল যখন ব্রাহ্মণদের অতি প্রিয় খাবার ছিল গরুর মাংস। বাড়িতে বিশেষ কোন অতিথি এলে সবচেয়ে ভাল ষাঁড়টিকে কেটে রান্না করা হত। টাইম মেশিনে পিছিয়ে গিয়ে তুমি কল্পনা কর, কালীপুজোর বলির পরে আমি হুইস্কির সাথে রোস্টেড বিফ খাচ্ছি।

কঙ্কনাঃ বিবেকানন্দ বলেছেন? তুমি পড়েছ?

অমলঃ হ্যাঁ। Collected works of Swami Vivekananda, Advaita Assram, 1963, Vol. VIII পড়লে পাবে। পৃষ্ঠা নং টাও বলে দিতে পারি। ১৭২ পৃষ্ঠা। কিছুদিন আগে আমাদের বন্ধুরা এই বিষয়ে আলোচনা করছিলাম। তাই মনে আছে।

কঙ্কনাঃ তাহলে কেন হিন্দুরা গোমাংস খাওয়া বন্ধ করল?

অমলঃ প্রাচীনকালে গরুর মাংসের বেশি প্রয়োজন ছিল খাদ্য হিসাবে। দুধ দেওয়া শেষ হয়ে গেলে গাভীর আর কোন সামাজিক প্রয়োজন থাকত না। তখন খাদ্য হিসাবে খুব উপযোগী। তারপরে কৃষিকাজের উন্নতি হওয়ায় লাঙ্গলের ব্যবহার এল। তখন লাঙ্গল টানতে গরুর মতন প্রাণীর খুব প্রয়োজন ছিল। তাই গো ধন বলা হত। যথেচ্ছ নিধনে গরুর সংখ্যা অনেক কমে গেলে চাষের অসুবিধা হবে বলে সমাজের মাথারা একটা নিয়ম বানিয়ে ফেলল যে, গোমাংস ভক্ষণ পাপ। উদ্দেশ্য হল গোধন রক্ষা করা। তখন ভাল উদ্দেশেই করা হয়েছিল, অর্থনৈতিক কারণে। কিন্তু এখন চাষবাস কত উন্নত হয়েছে, যন্ত্রের আগমন হয়েছে। এখন কি আর চাষের কাজে অত গরুর প্রয়োজন আছে? সারা পৃথিবীতেই চাষবাস হয়, আর গোমাংস খাওয়াও চলে। বলা যেতে পারে যে গোমাংস নিষিদ্ধ না করে নির্দিষ্ট পরিমাণে ব্যবহার করা হোক। পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই তো গোমাংসের ব্যবহার হয়। কেউ যদি নিরামিশাষী হয় সেটা আলাদা কথা। তা না হলে মানুষের পুষ্টির জন্য প্রোটিনের বড় উৎস হল গরু এবং শূয়োর। দুটোই বড় আয়তনের এবং সহজে পালন করা যায়। গো-পালন আর গোমাংস ভক্ষণের মধ্যে ভারসাম্য থাকলে তো ক্ষতি নেই। কোটি কোটি ব্রয়লার চিকেন পালন আর চিকেন মাংস খাওয়ার মতনই একটা ব্যালেন্স রাখতে হবে। যেমন, মাছ চাষ কর, আর মাছ খাও।

কঙ্কনাঃ শোভনারা তো কোনোদিন তো আমিষ খায় না, তাই হয়ত ওইদিন ওর বমি পাচ্ছিল।

অমলঃ ঠিক বলেছ। যারা যে জিনিস খায় না তাদের কাছে ওটা পছন্দ না ও হতে পারে। যারা মাছ খায় তাদের মধ্যেও কত রকমের রুচি। তুমি শুঁটকি মাছ খেতে পার না, চট্টগ্রামের লোকেরা

শুঁটকি ছাড়া খাবে না। অনেকে বাণ মাছ খায় না, বলে কেমন সাপের মতন দেখতে। অথচ শুনেছি বাণ মাছ নাকি খুব সুন্দর স্বাদের। আমি সিগারেট খাই না, সিগারেটের গন্ধ সহ্য হয় না। কিন্তু কত লোক দেখ কেমন আমেজে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ে। মদও আমার ভাল লাগে না, কিন্তু অনেকে তো খায়।

কঙ্কনাঃ সবটাই অভ্যাসের উপর নির্ভর করে। আমি শাড়িই পরি, সালোয়ার কামিজ পরতে আমি একদম স্বচ্ছন্দ বোধ করি না, কেমন যেন অস্বস্তি হয়।

অমলঃ তাহলেই দেখ, মানুষের খাওয়া পরা সব কিছুতেই কত ভিন্ন রুচি। এটা যদি হয়, তাহলে কে কী মাংস খাচ্ছে সেটা নিয়ে অন্যরা ভাববে কেন? আজকে একটা মাংসের বিরুদ্ধে কিছু লোক কথা বলছে, এর পরে কি নিরামিশাষী বনাম আমিশভোজীদের ঝগড়া শুরু হবে? মূল কথা হল, মনের সহনশীলতা থাকতে হবে। প্রকৃতিতেই তো আমরা পাই সুন্দর সহাবস্থানের শিক্ষা। প্রকৃতিতে বৈচিত্র আছে, ভিন্নতা আছে, পাহাড় আছে সমতল আছে, সমুদ্র আছে মরুভূমি আছে, বর্ষা আছে বসন্ত আছে। তাই তো বিশ্ব এত সুন্দর। মরুভূমি সমতলকে গ্রাস করলে বা সমুদ্র স্থলভাগকে গ্রাস করে ফেললে প্রলয় হবে। সমাজেও রুচি, চিন্তা, পছন্দের ভিন্নতা থাকুক, সহাবস্থান থাকুক। আমার যেমন ধ্রুপদী খেয়াল ভাল লাগে, তেমনি সুরেলা ইংরেজী গানও ভাল লাগে। টাইটানিকের গানটা তোমার ভাল লাগে না? আগ্রাসন কাম্য নয়। আমি তো শুনেছি নাগারা কুকুরের মাংস খায়। খাওয়া তো দূরের কথা, ভাবলেও আমার কেমন যেন বমি মনে হয়। কিন্তু নাগারা তো নিশ্চয়ই রেলিশ করে খায়। আমরা কি নাগাদের ঘৃণা করব? আমি নিজেও তো কলেজজীবনে দুই ধর্মের তথাকথিত নিষিদ্ধ দু রকমের মাংস খেয়েছি। জাপানীরা গেঁড়ি শামুক কাঁচা খায় লেবুর রস দিয়ে।

কঙ্কনাঃ বাব্বা, কী করে খায় কে জানে।

অমলঃ জাপানীরা কি অনুন্নত, রগচটা, অপরাধপ্রবণ, বর্বর?

কঙ্কনাঃ গরু তো এখনো কৃষিকাজে লাগে, আমরা দুধ খাই।

অমলঃ এখন চাষবাসে কত আধুনিকীকরণ হয়ে গেছে, যন্ত্র এসেছে, তাই তো উৎপাদন কত বেড়েছে। গরু দিয়ে লাঙ্গল টানা আর গোবর সার দিয়ে চাষ হলে এত লোকসংখ্যা নিয়ে আমরা খাবার কী করে পাব? তাই তো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আধুনিক কৃষিকাজ শেখার জন্য ছেলে রথীন্দ্রনাথকে আমেরিকায় পাঠিয়েছিলেন। গোমাংস তো শুধু মুসলমানেরা খায় না। অন্য ধর্মের লোকেরাও খায়। আমাদের দেশের মধ্যে গোমাংস নিয়ে যারা এত হৈচৈ করছে তারা বিদেশে গেলে কি হোটেলে কোনো খাবার খাবে না? ওখানে তো একই রান্নাঘরে সব ধরনের মাংস রান্না করা হয়। যার যা রুচি, তাকে সেই মাংসই শুধু পরিবেশন করা হয়।

কঙ্কনাঃ তবে, যাই বলো, মুসলমানেরা বড্ড গোঁড়া। ওরা দেখবে জলকে পাণি বলে। কেন, জল বললে কী হয়? মুসলমানত্ব ঘুচে যাবে?

অমলঃ আরে, পাণি তো সংস্কৃতে আছে। বাংলা ভাষার বাবা হল সংস্কৃত। সংস্কৃত থেকে হিন্দিও এসেছে। হিন্দু হিন্দিভাষীরাও জলকে পাণি বলে। তোমার বাংলা ভাষা এসেছে তো মাত্র এক হাজার বছর আগে, তার আগে লোকেরা কী ভাষায় কথা বলত? তবে এটা ঠিক, মুসলমান ধর্মের সাথে উর্দু ফার্সী ভাষার কিছুটা প্রভাব এসেছে ভাষার

মধ্যে। তবে বাংলায় সেটাও পাল্টাচ্ছে। এখন মুসলিম নামকরণে বাংলা শব্দ ব্যবহৃত হচ্ছে।

কঙ্কনাঃ তোমার সঙ্গে আলোচনা করে অনেকটা বুঝলাম। তবু গোমাংসটা মন থেকে মেনে নিতে পারছি না।

অমলঃ তা ঠিক। ছোটবেলা থেকে যা জেনে এসেছ তার থেকে সরে আসা কি সহজ? মন থেকে তুমি মেনে নিতে না পারলেও মনে অন্ততঃ বিদ্বেষ রেখ না। রবীন্দ্রসঙ্গীত গাওয়ার সময় যে মূর্ছনা তুমি ফুটিয়ে তোল, সেইভাবে বিশ্ব প্রকৃতির মতন সহনশীল হও। তাহলেই দেখবে মনে শান্তি পাবে। শোভনা মেহতা, কঙ্কনা মুখার্জি যদি একসঙ্গে পড়াশোনা করতে পারে, তাহলে আমার মতন সর্বভুক এক স্বামীকে তুমি আদরও করতে পারবে।

করোনার সালতামামি

গৌতম রায়চৌধুরী

২৪ মার্চ, ২০২০-তে ভারতে লকডাউন ঘোষণা করা হয়, সেদিন দেশে নতুন সংক্রমণের সংখ্যা ছিল মাত্র ৩৭। ২০২১-এর মার্চের প্রথম সপ্তাহে ২১৯টি দেশ জুড়ে করোনা ভাইরাসে ২৫ লক্ষ ২৫ হাজার মানুষ মারা গেছেন। গত বছরটা একটু ঝটিকদর্শন করা যাক।

আমরা মন্বন্তর, দেশভাগ, বিশ্বযুদ্ধ কিছুই দেখি নি। বইয়ে পড়েছি, কয়েকটা সিনেমায় দেখেছি। তাই আমাদের কাছে এই করোনা এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা, যার কিছুটা নিজস্ব উপলব্ধি আর বাকিটা পরের মুখে শুনে বা বই পড়ে।

প্রথম উপলব্ধি, করোনা যেন ফিরিয়ে দিল সেই আদিম ভয়ের অনুভূতি। শুধু ভাইরাসকে নয়, যে সামাজিকতা ছাড়া মানুষ বাঁচতেই পারত না, সেই সামাজিকতাকেই ভয়। এযেন জাতি-ধর্ম-ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সর্বজনীন ভয়। আমাদের দেশে বা অন্য দেশেও প্রায়শই সুনামি, খরা, বন্যা আঞ্চলিক যুদ্ধের অভিজ্ঞতা আছে, কিন্তু তা আমাদের জীবনে খুব একটা রেখাপাত করে না। পত্র-পত্রিকায় কিছু সংখ্যা হিসাবেই থেকে যায়। আমেরিকা বা ইউরোপের উন্নত দেশগুলি তো তৃতীয় বিশ্বের ক্ষয়ক্ষতিকে আমলই দেয় না। কিন্তু ক্ষুদ্রতায় এই ভাইরাসটি সমস্ত প্রাচীর ভেঙে দিয়েছে। 'সব পেয়েছির দেশ' মার্কিন মুলুকের সাথে আমার দেশের কোনো ভেদ নেই। আকবর বাদশা ও হরিপদ কেরানি একই ভয়ে ভীত।

দ্বিতীয় উপলব্ধি, যে ইন্দ্রজালটা আমাদের চোখের সামনে থেকে বেশ কিছু মানুষকে অদৃশ্য করে রেখেছিল, সেই পরদাটা ছিঁড়ে খানখান হয়ে গেল। সমাজের বেশ কিছু মানুষকে আমরা দেখেও দেখতাম না। সূর্য ওঠার আগে যে মানুষটা ময়লা সরিয়ে রাস্তা পরিষ্কার করে, যে লোকগুলি শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষায় মাছ-সবজির ডালা সাজিয়ে বাজারে বসে, সকালে 'ঝি-স্পেশালে' এসে যারা বাসন মাজে-ঘর মোছে, ডাক্তার-নার্স ছাড়া যে অসংখ্য মানুষ হাসপাতালগুলিকে সচল রাখে, এরা সবাই যেন কল্পকথার অদৃশ্য মানুষ। অতিমারী এইসব নীরব কর্মীদের চিনিয়েছে। 'পরিযায়ী শ্রমিক' শব্দ দুটি অভিধানেই ছিল। সারা ভারতে 'পরিযায়ী শ্রমিকদের' মোট সংখ্যার হিসাব রাষ্ট্রের কাছে নেই। কত পরিযায়ী শ্রমিক স্বভূমিতে ফিরতে গিয়ে মারা গেছে তার হিসাব সরকারের কাছে নেই। এরা যেন যুদ্ধে মৃত 'নামহীন সৈনিক'। ভারতব্যাপী লকডাউন ঘোষণার আগে দিল্লিশ্বর

এদের কথা ভাবেন নি, আবার ঘোষণার পরে রাজ্যের রাজ্যেশ্বরীও এদের জন্য চিন্তা করেন নি। হাজার হাজার মাইল হেঁটে এসে নিজগ্রামে ঢোকার আগে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিল। ভারতীয় অর্থনীতিতে পরিযায়ী শ্রমিকদেরও যে একটা ভূমিকা আছে সেটাই কেউ জানত না। কিন্তু, 'ওরা কাজ করে।'

তৃতীয়ত, দক্ষিণপন্থী মতাদর্শে বিশ্বাসীরা একনায়কসুলভ আচরণের সঙ্গে ক্রমাগত বিজ্ঞানকে অস্বীকার করে গেলেন। মৃত্যুর নিরিখে আমেরিকা শীর্ষে কিন্তু ২০২০-এর অধিকাংশ সময়, প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প মাস্ক ব্যবহার সহ 'WHO'-এর যাবতীয় নির্দেশকে অস্বীকার করে গেলেন এবং উৎসকারী হিসাবে চিনকে দোষারোপ করতে ব্যস্ত ছিলেন। ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট বোসুনারু একই পথের পথিক ছিলেন। দুজনেরই ধারণা ছিল করোনা সংক্রমণ সাধারণ সর্দি-কাশি ছাড়া কিছুই নয় এবং ক্লোরোকুইনের ব্যবহারই যথেষ্ট। ট্রাম্প তো ক্লোরোকুইন সরবরাহের জন্য ভারতকে হুমকিও দিয়েছলেন। আমাদের 'মহান' নেতা নরেন্দ্র মনোহর মোদিজী থালা-বাসন বাজিয়ে, করতালি দিয়ে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ন্যায় ১৮ দিনে করোনাযুদ্ধের অবসান হবে, ঘোষণা করে ছিলেন। তাঁর সাঙ্গপাঙ্গরা গরুর গোবর এবং চোনায় করোনা প্রতিষেধক খুঁজে পেয়েছিলেন। আমাদের গণতান্ত্রিক (?) সরকার, লোকসভা বা রাজ্য বিধানসভাগুলিকে সম্পূর্ণ অন্ধকারে রেখে, যাবতীয় গণতান্ত্রিক পরিসরকে অগ্রাহ্য করে, শুধুমাত্র প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে করোনা প্রতিরোধের চেষ্টা করে গেছেন। উপরন্তু, অতিমারীর সুযোগটা কাজে লাগিয়ে সব রকমের ভিন্ন মতকে চুপ করানোর চেষ্টা চালিয়েছেন এবং এখনও চালিয়ে যাচ্ছেন। অভূতপূর্ব অর্থনৈতিক সংকটকে পুরোপুরি শ্রমিক-কৃষক-সাধারণ মানুষের ঘাড়ে চাপিয়ে, শুধুমাত্র তথাকথিত সহজ শর্তে ব্যাঙ্কে ঋণ পাওয়ার, নাম দেওয়া হচ্ছে আর্থিক প্যাকেজ। করোনার কোপটা মূলত পড়েছে শ্রমের ওপর। বিশেষ করে পরিষেবা ক্ষেত্রে অদক্ষ শ্রমিকের চাহিদার ওপর। ফলে বেকারি বেড়েছে। অতিমারীর সুযোগ নিয়ে দেশে অঘোষিত জরুরি অবস্থা চালু করা হয়েছে। সম্প্রতি আমেরিকার 'ফ্রিডম হাউজ' নামের অলাভজনক সংস্থা রিপোর্ট দিয়েছে, দেশের মানুষের স্বাধীনতার নিরিখে ভারত 'ফ্রি' থেকে 'পার্টলি ফ্রি' শ্রেণিভুক্ত রাষ্ট্রগুলির তালিকায় নেমে এসেছে। অন্যদিকে অতিমারীর সুযোগে দেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে আরও কোণঠাসা করার চেষ্টা হচ্ছে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অতিমারীর আর এক পাওনা হল উৎকট বর্ণবৈষম্য, যা সাধারণ মানুষকে সার্বিকভাবে দুর্বল করে দিয়েছে।

গত এক বছরে অতিমারীর কিছু সদর্থক প্রভাবও লক্ষ করা গেছে। প্রথমত, পরিবেশ সচেতনতা। জঙ্গল আর জীবনবৈচিত্রকে ধ্বংস করে যে সভ্যতার অগ্রগতি তা আখেরে মানুষেরই অধোগতি। লকডাউনের সময় আমার যাদবপুরের ফ্লাটের ছোট্ট বাগানে একজোড়া কাঠবিড়ালির দেখা পেয়েছি এবং তারা এখনও রয়ে গেছে। এটা একটা বড় লাভ।

দ্বিতীয়ত, লকডাউনে গৃহবন্দী থাকাকালীন গৃহস্থালির দৈনন্দিন কাজে দোর্দণ্ডপ্রতাপ বহু পুরুষকেই অংশ গ্রহণ করতে হয়েছিল। আশা করা যায়, এই বাধ্য-শ্রমদান সমাজে লিঙ্গ বৈষম্য দূর করতে সাহায্য করবে।

সালতামামি শেষ করব মৃত্যুর অভিজ্ঞতা দিয়ে। প্রথমদিকে মৃত্যু ছিল দূরদর্শনের পরদায় বা 'আনন্দবাজারের' ভিতরের পাতার এক কোণে

লেখা একটা সংখ্যা মাত্র, যা প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছিল। আমরা কিন্তু গ্রাহ্য করি নি। যে দিন করোনা নিজের বা বান্ধবের ঘরে থাবা বসাল তখন আর সে সংখ্যা থাকল না, দরজা খুলে সামনে এসে দাঁড়াল। তা দাঁড়াক! মৃত্যু তো জীবনেরই অঙ্গ। কিন্তু করোনা মৃত্যুকে বড় ভয়াল করে তুলল। শেষ শয্যায় স্বজনকে পাশে পাওয়া গেল না, অন্তিম যাত্রায় তারা সঙ্গী হল না।

করোনাকালে কত মৃত্যু দেখলাম, আপন পরিবারে, পাড়ায়, দেশে-বিদেশে। এদের মধ্যে যারা 'সেলিব্রিটি' তাদের নিয়ে কত না হৈচৈ হল— পত্রিকায় বা টেলিভিশনের পরদায়। কিন্তু যখন কোনো সাধারণ মানুষ চলে যায়, সেই বিচ্ছেদ, সেই শোক তার কাছের মানুষের পরিধি পেরিয়ে বেশিদূর এগোয় না।

এমন এক সাধারণ মানুষ ছিলেন কলকাতা মেডিকেল কলেজের অস্থায়ী অধ্যক্ষ ডাঃ যাদব চট্টোপাধ্যায়। গ্রাম থেকে উঠে আসা কৃতী ছাত্র যাদব ছিলেন মেডিকেল কলেজের অ্যানাটমি বিভাগের প্রধান। ছাত্রদরদী এবং জনদরদী। কালনা-ধাত্রীগ্রামের মানুষ দুহাত তুলে ডাক্তার বাবুর সুনাম করছে। মেডিকেল কলেজকে যখন কোভিড-হাসপাতালে পরিণত করা হল, তার নেতৃত্বে ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে আমাদের এই বাংলায় করোনার বিরুদ্ধে লড়াই তিনি ছিলেন প্রধান যোদ্ধা। যদিও কাগজে/টিভিতে তাঁর কথা শোনা যেত না। নিজে করোনায় আক্রান্ত হলেন, একমাস লড়াইয়ের পর তা থেমে গেল ২০২১-এর ১৯ জানুয়ারি। না, রাষ্ট্র তাকে 'পরমবীর চক্র' বা 'বঙ্গবিভূষণ'-য়ে ভূষিত করে নি। কিন্তু আমরা তাঁকে মনে রাখব। আর মনে রাখব হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার আগের রাতে তার শেষ কবিতাটা।

একাকীত্বে হেঁটে যাওয়া।

যাদব চট্টোপাধ্যায়॥

একাকীত্বে হেঁটে যাওয়া যায়—
আজীবন তা শিখতে লাগে।
যেমন ফাঁসির দড়ি, হাতে নিয়ে
দৃপ্ত ক্ষুদিরাম, বলেছিল বন্দেমাতরম।
যেমন পতাকা বুকে, দৃঢ় হাতে, বজ্রগর্ভ
স্বরে,
বলেছিল মাতা মাতঙ্গিনি "বন্দে
মাতরম"।
কতটা লড়াই হলে, যোদ্ধা বলা যায়?
যুদ্ধ কতদিন চলে, ইতিহাস দ্যাখো,
মহাভারতের যুদ্ধ, রাম-রাবণের যুদ্ধ,
দ্যাখো ট্রোজান ওয়ার
কতদিন, কতদিন, কতো দ্রুত শেষ—
হত্যা করো, রক্ষা করো, রাজার আদেশ—
তারপর বৃষ্টি ধৌত কুরুক্ষেত্র, ভূমি—
মৃত্যু শেষ, বিজয়-উৎসবে এসো
জীবনকে চুমি।

এ এক অসম যুদ্ধ, কোভিডের
সীমারেখা নেই
এখানে অদৃশ্য ভাইরাস, হাতে নেয়
জীবনের রাশ
এই গ্রহ তার বধ্যভূমি, মানুষ আতঙ্কে
থাকে—
একাকীত্ব জুড়ে তার বিধিলিপি আঁকে।
পিছনে তাকানো বন্ধ, ভাই বোন বন্ধু
পরিজন
যদি বাঁচো, ফিরে এসো, নাহলে একক
নির্জন বিসর্জন।
একাকীত্বে হেঁটে যেতে হয়—
মরু ঝড়ে, লু-হাওয়ায়, খেজুর পাতার
শব্দে
এক পা এক পা ফেলে, সামনে তাকাও
এই দুরূহ সময়।

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়—ব্যতিক্রমী অভিনেতা

মৃণাল দত্ত

চলমান জগৎ ও প্রকৃতির রূপরস মানবমনে ছায়া ফেলে, তাকে ধরে রাখে স্মৃতি কোঠায়। কিন্তু সে আর কতক্ষণ? কতদিন? তাই মানুষ গুহাচিত্রে, নানাধরনের চিত্রলিপিতে তাকে বাঁচিয়ে রাখে। এভাবেই ভাষা-শিল্প-সাহিত্য নিয়ে মানুষ এগিয়েছে। চলচ্চিত্র তেমন একটি মাধ্যম— সৃজনশিল্পের কনিষ্ঠতম শিল্প। শতবর্ষের দোরগোড়ায় এই শিল্প আধুনিক জীবনের বিনোদন সঙ্গী। প্রাচীন গ্রিসে আরিস্ততল, ইউক্লিড, আর্কিমিদিশ তাদের জ্ঞানকে আলোকতত্ত্ব চর্চার মাধ্যমে রূপ দিয়েছেন। আরব দেশের বিজ্ঞানী আলহাসান চোখ ও দৃষ্টির ভূমিকা নিয়ে আন্তরিক গবেষণায় আবিষ্কার করলেন অবিরত দৃষ্টির তত্ত্ব— Persistance of Vision। এই তত্ত্বই চলচ্চিত্রের গর্ভগৃহ। চোখ দিয়ে আমরা যা দেখি সে দেখা মন কিছু সময় ধরে রাখে, ক্ষণিকের জন্য— এক সেকেন্ডের বারো ভাগের একভাগ। সে জন্যই একসারি স্থির ছবি যদি এভাবে দেখতে থাকি তবে আড়াল থাকে না, মনে হয় স্থির ছবি সচল হয়ে উঠেছে। গ্রিফিথ তৈরি করলেন চলচ্চিত্রের ভাষা— বিভিন্ন চিত্রকল্পের মাধ্যমে প্রকাশ পেলো মানবিক আবেগ। ভারতীয় চলচ্চিত্রের প্রথম পরিচালক দাদাসাহেব ফালকে ১৯১৩ সালে তৈরি করলেন 'রাজা হরিশচন্দ্র' নামে প্রথম কাহিনী চিত্র। কথাহীন চলচ্চিত্র যুগ পার হয়ে ভারতীয় চলচ্চিত্র সবাক হলো ১৯৩১-এ 'আলম আরায়', পরিচালনা করেছিলেন আদ্রেশি ইরানি হিন্দি ভাষায়। চলচ্চিত্র নির্বাক থেকে সবাক হলো কিন্তু চলচ্চিত্র আধুনিক শিল্প মাধ্যমে পরিণত হয় যাঁদের নিরন্তর প্রচেষ্টায় তাঁরা হলেন সত্যজিৎ রায় ও চিদানন্দ দাশগুপ্ত। ১৯৪৭ সালে তাঁরা গড়ে তোলেন ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি। দেশী বিদেশী চলচ্চিত্র দেখে নিয়ে নিজস্ব ভুবন তৈরি করলেন তাঁরা। ১৯৫৫ সালে সত্যজিৎ রায়ের নির্মাণ 'পথের পাঁচালি' বাংলা চলচ্চিত্রের পুরাণ নির্ভরতা, ভক্তি রসের প্রাবল্য ও ভাবাবেগের নির্ভরতা কাটিয়ে হয়ে উঠলে সামাজিক চিন্তা-ভাবনার প্রগতিবাদী হাতিয়ার।

চলচ্চিত্র পরিচালকের সৃজন। কিন্তু তা রূপায়নে চাই অনেক অনেক মানুষের সহযোগিতা— এদের মধ্যে থাকেন আলো প্রক্ষেপন শিল্পী, চিত্রগ্রাহক এবং অবশ্যই অভিনেতা। স্টুডিওর অন্দর মহল কিংবা বাইরের যে কোন জায়গায় চলচ্চিত্র তৈরি হয় এইসব মানুষের সাহায্য-সহায়তায়— চলচ্চিত্র তাই যৌথ শিল্প। তবে সন্তানের উন্মেষ যেমন মাতৃজঠরে তেমনি চলচ্চিত্রের ভ্রুণ সম্ভাবিত হয় পরিচালকের ভাবনায়। কি বলা হবে, কেমন করে হবে তার রূপায়ন এবং কার পারবেন পরিচালকের ভাবনাকে কথার বিন্যাসে সাজিয়ে তুলতে? এইখানে অভিনেতার গুরুত্বপূর্ণ স্থান।

বাংলা চলচ্চিত্রে বহু অভিনেতা-অভিনেত্রী পরিচালকের ভাবনা রূপায়নে সঙ্গ দিয়েছেন। প্রমথেশ বড়ুয়া থেকে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় পর্যন্ত যে অভিনয় ধারা বাংলা চলচ্চিত্রকে আবেগমথিত রেখেছে তা এক ঐতিহ্য রচনা করেছে। এসময়ের চলচ্চিত্র ছিল মুখ্যত সাহিত্য নির্ভর এবং চেতনাকে সুতীক্ষ্ণ সামাজিক করে তোলার চাইতে হৃদয়ের অন্তঃস্থলে বেদনা/ভালোবাসা/করুণাকে সজাগ করেছে। বাংলা চলচ্চিত্রের প্রথম দিকের পরিচালকেরা অভিনেতা/অভিনেত্রাকে সেভাবেই নির্দেশ দিতেন। যমুনা বড়ুয়া, কানন দেবী, মলিনা

দেবী, সন্ধ্যারাণী সকলেই আমাদের হৃদয়ে দোলা দিয়েছেন। অভিনেতারাও তাই। প্রমথেশ বড়ুয়া, রবীন মজুমদার, সায়গল, পাহাড়ি সান্যাল কেউই এই আবেগকে কাজে না লাগিয়ে পারেন নি। ব্যতিক্রম হিসেবে যারা ছিলেন তাদের মধ্যে ছবি বিশ্বাস, কমল মিত্র, ধীরাজ ভট্টাচার্য, ছায়াদেবীরা ছিলেন কোমলে কঠোরে।

প্রথমদিকের বাংলা চলচ্চিত্র একারণেই কখনো উনিশ শতকের বাংলা রেনেশাঁর উত্তরাধিকারত্ব অর্জন করতে পারেনি— অন্তত সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন, ঋত্বিক ঘটকের আবির্ভাব না হওয়া পর্যন্ত। ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করেছিল দেশ বিভাজনের মধ্য দিয়ে, ফলশ্রুতিতে বাংলা সাহিত্যে, চলচ্চিত্রে তার প্রভাব পড়েছিল অপরিসীম। ১৯৫০ সালে 'ছিন্নমূল' বাস্তুহারাদের জীবন অবলম্বনে নিমাই ঘোষ চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন। এই ছবির চিত্রনাট্য লিখেছেন সত্যজিৎ রায়, স্বর্ণকমল ভট্টাচার্যের কাহিনী অবলম্বনে। উদ্বাস্তু কৃষকদের নিয়ে নির্মিত এই ছবি তখনকার সামাজিক বাস্তবতার এক অনবদ্য রূপায়ণ। অভিনয় করেছিলেন গঙ্গাপদ বসু, বিজন ভট্টাচার্য, শান্তা দেবী, ঋত্বিক ঘটক, শোভা সেনের মতো বিশিষ্ট অভিনেতা-অভিনেত্রী। বলা যেতে পারে চলমান জীবনের বাস্তবতা এই ছবির মধ্য দিয়ে বাংলা জায়গা করে নেয়। ১৯৫৫-তে নির্মিত 'পথের পাঁচালী' নিয়ে এল বাংলা রেঁনেশার নবজাগৃতি— চেতনার আশ্চর্য বিকাশে সমুজ্জ্বল হল বাংলা ছায়াছবি। এই সময়ের আরো যাঁরা বাংলা চলচ্চিত্র পরিচালনায় বুদ্ধি, মেধা ও যুক্তির সঙ্গে হৃদয়কে মুক্ত বেণীর মতো সংযোজিত করলেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন মৃণাল সেন, ঋত্বিক ঘটক, তপন সিংহ, রাজেন তরফদার প্রমুখ। এঁদের অভিনেতা-অভিনেত্রী নির্বাচনে এলো নতুন নতুন মুখ। বাংলা চলচ্চিত্র তারকা নির্ভরতায় নয়, অভিনয়ের পারদর্শিতার দিকে নজর ঘেরালো।

১৯৫৯-এ 'অপুর সংসারে' সত্যজিৎ রায় আবিষ্কার করলেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় অভিনয়ের পাঠ নিয়েছিলেন নাট্যাচার্য অহিন্দ্র চৌধুরীর কাছে। তবে শিশির ভাদুড়ি ছিলেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের পছন্দের শিক্ষক। তাঁর নাটকে সৌমিত্র অভিনয় করেছেন। ১৯৫৯ সালে শিশির ভাদুড়ির প্রয়াণ। সারা জীবন শিশির ভাদুড়িকে তিনি শ্রদ্ধার আসনে রেখেছেন। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ৩৫০টির বেশী চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন। ২০১২ সালে অভিনয় কৃতিত্বের জন্য তিনি দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কারে সম্মানিত হন। মঞ্চে দাঁড়িয়ে তিনি বলেছেন '..দূরে কোন শ্রমিক পল্লিতে গিয়ে মানুষের জন্য কাজ করতে পারতাম তাহলে আমার জীবন সার্থক হতো। পঞ্চাশ বছরে বেশি সময় ধরে আমার দেশের মানুষ আমাকে গ্রহণ করে এসেছে, ভালোবেসে এসেছে তাদের নিজেদের একজন বলে আমাকে ভাবিয়েছে।' তিনি কবিতা লিখেছেন, 'এক্ষণ' পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন। শিল্প সংস্কৃতির সৃজনশীল মঞ্চের একজন প্রতিভাবান ব্যক্তি সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় জনগণের জন্য নাটক করেছেন। একটি কবিতায় তিনি লিখেছেন ঃ

'নিসর্গের মধ্যে দাঁড়ান বলে
তার দুচোখ জলে ভরে উঠল
অথচ পৌষের দোলাই মানুষদের
সে কিছুতেই স্পর্শ করতে পারল না।'

কিংবা—

'রাতের অলৌকিক জ্যোৎসার ভিতর
অনিন্দ্য নিসর্গের খুব কাছাকাছি
ঝুপড়িতে গরিবেরা থাকে।'

গরিব সর্বহারা অন্ত্যজ মানুষদের পাশে থাকা ব্যাকুলতা অভিনেতা সৌমিত্রকে বাঙালী জীবনের কাছে নিয়ে এসেছে। নিজেকে তিনি বাম মতাদর্শের শরিক বলে মনে করতেন। একারণে যেখানে সাধারণ মানুষদের উপর অন্যায় অবিচার, রাষ্ট্রের অমানবিকতা সেখানে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় দৃঢ়স্বরে প্রতিবাদ করেছেন। মার্কিন হামলায় বিধ্বস্ত ভিয়েৎনামের সমর্থনে তাঁর দৃঢ়কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছিল 'আমার নাম তোমার নাম ভিয়েৎনাম', খাদ্য আন্দোলন, শিক্ষক আন্দোলন যেমন সমর্থন করেছেন তেমনি সোচ্চার ছিলেন জরুরি অবস্থার বিরুদ্ধে, নাট্য নিয়ন্ত্রণ আইনের বিরুদ্ধে। তথাকথিত বিদ্বজনদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে গণশক্তি পত্রিকায় বিবৃতি দিয়েছেন। সি.এ.এ, এন.আর.সি. কিংবা নারী নিগ্রহের বিরুদ্ধেও ছিল তাঁর প্রতিবাদ। বর্তমান সময়ের অশান্ত ভারতবর্ষে যে ধর্মীয় জিগির চলছে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বিভেদ তৈরি করার রাজনীতি তাঁর বিরুদ্ধে সৌমিত্র বলেছেন, 'কে রামকে ভালোবাসলো কে রহিমকে তা কোনো ব্যাপারই হতে পারে না। এসবের বিকল্প হতে পারে বামপন্থা।'

আমরা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের সমগ্র অভিনয় জীবনের পর্যালোচনা করছি না। আমরা আলোচনা করছি চলচ্চিত্রের জমকালো গ্ল্যামারের বাইরে দাঁড়িয়ে তিনি মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন। যেখানে অত্যাচার, অসাম্য সেখানেই তিনি প্রতিবাদ করেছেন, এযেন তাঁর অভিনীত 'কোনি' ছবির ক্ষিদ্দা, যিনি অমিততেজে বলেছেন 'ফাইট, কোনি ফাইট'। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় একারণেই আমাদের জীবনের চলার পথের আজন্ম সঙ্গী।

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়— কিছু তথ্য

জন্মস্থান — শিয়ালদহের কাছে মির্জাপুর স্ট্রিটে।
জন্ম : ১৯.০১.১৯৩৫ — প্রয়াণ : ১৫.১১.২০২০
পিতা : মোহিত কুমার চট্টোপাধ্যায় মাতা : আশালতা দেবী
চলচ্চিত্রে অভিনয় : ৩৫০, অভিনয় জীবন- ৬১ বছর
সত্যজিৎ রায়ের ছবি করেছেন ১৪টি
নাটক : লিখেছেন ৩০টি। নাট্যজীবনের শুরু 'তাপসী' নাটকে।
রাজকুমার, টিকটিকি, নীলকণ্ঠ, নামজীবন, কিং লীয়র নাটকে অভিনয়/পরিচালনা।
হিন্দী ছবি পরিচালনা : স্ত্রী কা পত্র
কবিতার বই : জলপ্রপাতের কাছে দাঁড়াব বলে। প্রচ্ছদ- সত্যজিৎ রায়।
শব্দেরা আমার বাগানে, হায় চিরজল, পদ্মবীজের মালা, হলুদ রোদ্দুর, কবিতা সমগ্র
সম্মাননা : পদ্মভূষণ (২০০৪), সঙ্গীত নাটক অ্যাকাদেমী (২০০৮), বঙ্গবিভূষণ (২০১৩), দাদাসাহেব ফালকে (২০১৬), ফরাসী সরকারের নাইট অফ লিজিয়ঁন (২০১৮)

পূণ্যভূমি শিলং

জয়ন্ত কুমার ভট্টাচার্য্য

পাহাড় ঘেরা নয়। পাহাড়ের চূড়ার ওপর ছোট্ট শহর। পথ চলতে চলতে মনে হবে, মানুষ যেন প্রকৃতির সাথে বন্ধুত্ব করে নিয়েছে। আন্তরিক ভালোবাসায় সহাবস্থান। মেঘের রাজ্য। অথচ, কোনও সময়তেই মেঘ কাউকে বিভ্রান্ত করেনা। আমরা যারা সমতলে বাস করি, মেঘকে মাথার ওপর দেখতে অভ্যস্ত। মেঘ থাকে ওপরে। আমরা থাকি মাটিতে। সময় বিশেষে বেশি মেঘ আমরা বরদাস্ত করিনা। আমাদের মতে, মেঘ চলবে আমাদের কথা মত। আমরা যখন ডাকব,

সে আসবে; আবার আমাদের কাজের সময় সে বিরক্ত করবেনা।

কিন্তু, এ দেশের মানুষ অন্য রকম। তারা যেন মেঘের সাথে ভাব করেছে। মেঘ, মানুষ, গাছ, পশুপাখি—সবাই একসাথে থাকে। কেউ কারুর প্রতিপক্ষ নয়। কেউ কাউকে ভয় করে না। মানুষ রাস্তা দিয়ে হাঁটবে, কখন যে এক টুকরো মেঘ তাকে ভালোবাসার স্পর্শ দিয়ে যাবে সে জানতেও পারবেনা। তবে অবশ্যই অনুভব করবে শীতল মেঘের স্নিগ্ধ পরশ। মনে মনে ভালোবাসার প্রত্যুত্তর জানিয়ে দেবে মেঘকে। এই দেশে প্রকৃতি মানুষের সাথে কথা বলে; মানুষ পাখির সুরে গান গায়; গাছপালা বনান্তের সাথে মানুষের হয় হৃদ্যতা, আর মানুষের সাথে গোপন কথা বলে মেঘ। তাই বোধ হয় এই মেঘের রাজ্যের নাম রাখা হয়েছিল 'মেঘালয়'। আর এই ছোট্ট শৈল শহরের নাম শিলং।

পাহাড়ের ওপর তো অনেক শহরই আছে। কিন্তু কি বিশেষত্ব এই শহরের?

পাহাড়ের নাম শিলং। শহরের নামও শিলং। কোথা থেকে এল এই নাম?

প্রচলিত স্থানীয় প্রবাদ অনুযায়ী এখানে একজন সুন্দর যুবক থাকতেন, যাঁকে এখানকার মানুষেরা দেবতা বলে মানতেন। তাঁর নাম ছিল শাইল্লং— যার থেকে পরবর্তীকালে এই পর্বত চূড়ার নাম হয় শিলং এবং শহরটিও কালক্রমে শিলং নামে পরিচিতি লাভ করে।

তাই বোধ হয় এখানকার মানুষ খুব সুন্দর— সবাই সুন্দর। নারী, পুরুষ— সবাই। আর এঁরা চেহারায় যা সুন্দর, তার থেকে অনেক বেশি সুন্দর মনের। এঁদের প্রত্যেকের মন খুব পরিষ্কার, সহজ আর সরল। এঁদের মতো আতিথেয়তা সমতলের অনেকেই জানেন না। দেহে-মনে এঁরা নিজেরা সুন্দর বলে, এঁরা সুন্দরের পূজারী। সুন্দরের কদর করতে জানেন এঁরা।

হয়তো এই কারণেই, সমতল ভারতবর্ষের দুজন সুন্দর মানুষ তাঁদের কর্মময় জীবনের কিছুটা সময় এই সুন্দর শৈল শহর-এ কাটিয়েছিলেন। এই দুজন কর্মপ্রেমী তাঁদের নিজেদের জীবনে এমন দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন, যা পৃথিবীতে চিরস্থায়ী হয়ে থাকবে।

এই দুজন মানুষই খুব কাছাকাছি জায়গায় জন্মগ্রহণ করেছেন, থেকেছেন এবং মানুষ হয়েছেন। দুজনের মধ্যে একজন ছিলেন কট্টর বাস্তববাদী সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী, পৃথিবীতে ছিলেন চল্লিশ বছরের কিছু কম সময়। অন্যজন, কল্পনার জগতের কবি, পৃথিবীতে ছিলেন আশি বছরের কিছু বেশি। দুজনের যেখানে মিল ছিল, দুজনেই কর্মে বিশ্বাস করতেন। কাজ ছাড়া জীবন হয়না। তার থেকেও যেখানে এই দুজনের মিল ছিল, তা হল— এঁরা দুজনেই বিশ্বাস করতেন, মানব জীবনের সমস্ত কিছুর ভিত্তি হচ্ছে উপনিষদ্। আর উপনিষদ্-এর মূল মন্ত্র হচ্ছে মানুষ। সুতরাং, মানুষকে না জানলে, মানুষের কথা না বুঝলে, কখনোই জীবনের গভীরে পৌঁছানো সম্ভব নয়। সেই মানব জীবনের কোনো অর্থই হয় না।

সন্ন্যাসীটি হচ্ছে স্বামী বিবেকানন্দ আর কবিটি হচ্ছেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। আক্ষরিক অর্থে স্বামীজির কার্য্যকাল ছিল সাত থেকে আট বছর। কিন্তু, বিশ্বকবি সেদিক থেকে কাজ করার জন্য পেয়েছিলেন প্রায় ছয় দশকেরও বেশি সময়।

স্বামী বিবেকানন্দ শিলং আসেন একবার,

তাও প্রায় জীবনের শেষ প্রান্তে, যখন তিনি সামগ্রিক ভাবে অত্যন্ত অসুস্থ— ১৯০১ সালের এপ্রিল মাসে। লিখিত তথ্য অনুযায়ী সেই সময়ে শিলং-এর লাবান-এ তিনি ছিলেন প্রায় কুড়ি থেকে পঁচিশ দিন। সঙ্গে ছিলেন রায়সাহেব কৈলাশ চন্দ্র দাস ও যতীন্দ্রনাথ বসু।

সময়টা ছিল ১৯০১ সালের এপ্রিল। আর স্বামীজি দেহ রাখেন ১৯০২ সালের জুলাই মাসে। আমরা জানি, মৃত্যুর আগে কয়েক বছর স্বামীজি বেশ অসুস্থ ছিলেন। এই সময়ে শিলং-এর চীফ কমিশনার ছিলেন স্যার হেনরি জন স্টেডম্যান কটন। এই কটন সাহেব, শিলং-এ থাকাকালীন স্বামীজির চিকিৎসার প্রভূত ব্যবস্থা করেন। কটন সাহেব শিলং শহরে কুইন্টন হল-এ স্বামীজির এক জনসভার আয়োজন করেন ২৭ এপ্রিল ১৯০১, সন্ধ্যাবেলায়। এই জনসভায় কটন সাহেব সভাপতিত্ব করেন এবং স্বামীজি একটি ভাষণ দান করেন। স্বামীজির শিলং ভ্রমণ সম্বন্ধে বিশেষ কোনও লিখিত তথ্য পাওয়া যায়না। প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ এবং কিছু পত্র-পত্রিকায় মুদ্রিত সংবাদের ওপর ভিত্তি করে আমরা যা জানতে পারি, তা হল, স্থানীয় জনগণ স্বামীজির বক্তৃতা আন্তরিক ভাবে গ্রহণ করেছিলেন এবং তা সমস্ত রকম মানুষের কাছ থেকে বহুল প্রশংসা লাভ করেছিল। এই বক্তৃতা দেওয়ার পরেই স্বামীজি বেশ অসুস্থ হয়ে পড়েন। স্বামীজির শিলং বক্তৃতার মূল কথা ছিল, "mass কে জাগাতে হবে: তবে তো দেশের কল্যাণ ভারতের কল্যাণ"— সামগ্রিক শিক্ষা - এই ছিল স্বামীর মূল লক্ষ্য। যদিও স্বামীজির শিলং বক্তৃতার ভিত্তি ছিল সনাতন হিন্দুধর্ম, তিনি যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করে দিয়েছিলেন, যে এই হিন্দু ধর্মের মধ্যেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে মানব কল্যাণের মূল তত্ত্ব।

স্বামীজি ব্যক্তিগত জীবনে কোনও আচার-অনুষ্ঠান বা আড়ম্বরে বিশ্বাস করতেন না। তিনি বিশ্বাস করতেন একমাত্র মানুষে এবং মানবতাবাদে; যার মূল ভিত্তি আমাদের সনাতন দর্শন। মানুষের মধ্যেই ঈশ্বর। মানুষের সেবাই হচ্ছে ঈশ্বর আরাধনার মূল মন্ত্র—

"বহুরূপে সম্মুখে তোমার,
ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর।
জীবে প্রেমে করে যেই জন,
সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।"

এই বাণী তিনি ছড়িয়ে দিয়েছিলেন দেশে দেশে, জনে জনে। এই বাণী তিনি ছড়িয়ে দিয়েছিলেন শিলং পাহাড়ে। সেখানকার মানুষ জানল আমাদের চিরায়ত দর্শনের কতখানি গভীরতা। তাঁরা জানলেন স্বার্থের বাইরে বেরিয়ে এসে পরের উপকার করার মধ্যে কতখানি আনন্দ। স্বামীজি এই মানবসেবার বার্তা পৌছে দিলেন শিলং-এর পাহাড়ে। তাই আজও শিলং সবার কাছে হয়ে আছে পবিত্র ভূমি আর স্বামীজি, শিলং-এর মানুষের কাছে হয়ে আছেন মানব সেবার বার্তাবাহক।

এই মানব সেবার বার্তা নিয়ে আরো একজন প্রকৃত মানুষ পৃথিবীতে এসেছিলেন এবং ছিলেন স্বামীজির সমসাময়িক, যদিও এই গ্রহে বসবাসের সুযোগ পেয়েছিলেন স্বামীজির প্রায় দ্বিগুণ সময়। কার্য্যকালের সময় অনেক গুণ বেশি। তিনি ছিলেন গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। যাঁর জীবনের মূল কথাও ছিল মানুষ এবং মানব সেবা। তাঁরও জীবনের মন্ত্র ছিল—

আপন হতে বাহির হয়ে বাইরে দাঁড়া,
বুকের মাঝে বিশ্বলোকের পাবি সাড়া।।

কল্পনার জগতের কবি হয়েও সমাজের জন্য কি করা যায়, মানুষের জন্য কতখানি ভাবা যায়। তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রবীন্দ্রনাথের জীবন। একটা মানুষ, যিনি জীবদ্দশায় পার্থিব সুখের চেয়ে মানসিক শোক পেয়েছিলেন অনেক বেশি, তিনিই মূলমন্ত্র করে নিলেন প্রাচীন উপনিষদ্-এর বাণী— "আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি।"

গুরুদেব ছিলেন আনন্দের দূত। আনন্দের বাণী এমন ভাবে মানুষের মধ্যে প্রচার বোধ হয় হয় পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। এই বার্তাই তাঁর সমস্ত রচনার মধ্যে বার বার ফিরে আসে। 'গীতাঞ্জলি'-ও দিয়েছিল মানুষের মধ্যে সেই আনন্দের বার্তা। এই বার্তার জন্যই সেই সময়কার অস্থির পৃথিবী তাঁর রচনাকেই মনোনীত করল এশিয়ার প্রথম নোবেল পুরস্কার-এর যোগ্য প্রাপক হিসাবে। 'আনন্দের' কথা তিনি বলতে গিয়েছেন প্রায় সারা পৃথিবীতে, আর এই কথাই বলতে গিয়েছিলেন তিনি শিলং পাহাড়েও।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর কর্মময় জীবনে শিলং যাবার সুযোগ করে নিয়েছিলেন তিনবার। প্রথম ১৯১৯-এ, দ্বিতীয়বার ১৯২৩-এ এবং ১৯২৭এ— কবি তখন ছেষট্টি বছরের প্রৌঢ়। কিন্তু, মনে তিনি তখনও সবুজ আর কাঁচা। আধমরাদের ঘা দিয়ে বাঁচাবার জন্য তখনও তিনি প্রস্তুত। এরপর কবি পৃথিবীর বাতাস গ্রহণ করেছেন আরো প্রায় চোদ্দ বছর।

শিলং কবির ভালো লাগত। শিলং-এর পাহাড় কবিকে বারবার হাতছানি দিত।

১৯১৯-এ প্রথম শিলং-এ এসে কবি ছিলেন ব্রুকসাইড-এ। দ্বিতীয়বার ১৯২৩-এ তিনি ছিলেন তারই কাছে আর একটি বাড়িতে— জিৎভূমি। আর শেষবার ১৯২৭-এ শেষ শিলং ভ্রমণ-এ কবি ছিলেন লাইমোখরা'র আপল্যান্ডস-এ। প্রথমবার কবি যে বাড়িতে ছিলেন, ব্রুকসাইড, সে বাড়িটি বর্তমানে মেঘালয় সরকারের প্রচেষ্টায় একটি দর্শনীয় স্থান হিসেবে প্রাধান্য পেয়ে থাকে। এই বাড়ির খুব কাছেই মেঘালয় বিধানসভা ভবন। তাই, মেঘালয় বিধানসভার অধিবেশন চলাকালীন দর্শনার্থীদের একটু অসুবিধায় পড়তে হতে পারে। দ্বিতয়বার কবি ছিলেন এই ব্রুকসাইড বাড়ির-ই অদূরে জিৎভূমি-তে। এই বাড়িটি এখন ব্যক্তিগত মালিকানাধীন এবং বহিরাগতদের প্রবেশ নিষেধ। তৃতীয়বার অর্থাৎ ১৯২৭-এ কবি শিলং-এর লাইমোখরায়, যেখানে আপল্যান্ডস বাড়িতে ছিলেন, সেটি এখন দেখার অবস্থায় নেই।

কবির শিলং ভ্রমণ-এর সাথে কয়েকটি ঘটনা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে। বলা যায়, কবির জীবনের সেই ঘটনাগুলোর উল্লেখ, শিলং ভ্রমণকে বাদ দিলে অসম্পূর্ণ থেকে যাবে; আবার কবির শিলং ভ্রমণ সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে, সে ঘটনাগুলোর উল্লেখ না করলে, তার যথার্থ রস অনুভব করা যাবেনা।

প্রথম শিলং ভ্রমণ (১৯১৯)-এ কবি ছিলেন ব্রুকসাইড বাড়িতে। ছিলেন প্রায় তিন সপ্তাহকাল। ব্রুকসাইড বাড়িতে কবি পৌঁছে প্রথম চিঠিটি লেখেন মিস্ রাণু অধিকারীকে। রাণু ছিলেন কবির পত্রমিতা। দুজনের বয়সের ব্যবধান পঁয়তাল্লিশ বছরের। প্রথম চিঠিতে এগার বছর বয়সের রাণু ছাপ্পান্ন বছরে বিশ্বকবিকে লিখলেন, "আমি আপনার গল্পগুচ্ছের সব গল্প পড়েছি, আর বুঝতে পেরেছি।" এই মিস্ রাণু অধিকারীই পরবর্তী কালে হয়েছিলেন লেডি রাণু মুখার্জী— বিশিষ্ট শিল্পপতি স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের পুত্র

বীরেন্দ্র'র স্ত্রী। কবি প্রথম চিঠিতে রাণুকে লিখলেন, "কাল এসে পৌঁছেছি শিলং-পর্বতে। পথে কত যে বিঘ্ন ঘটল তার ঠিক নেই। .....দেখে আশ্চর্য বোধ হয়, এখনো পাহাড়টা ঠিক আছে; তাই তোমাকে চিঠি লিখেছি কিন্তু আর বেশি লিখলে ডাক পাওয়া যাবেনা। অতএব ইতি—।"

ভাবা যায়? একটি বারো বছর বয়সের বালিকাকে চিঠি লিখছেন সাতান্ন বছর বয়সের বিশ্বকবি। এ বন্ধুত্ব অবশ্য মাত্র আট বছর। ১৯১৭ থেকে ১৯২৫। রাণু'র লেখা প্রথম চিঠি থেকে শুরু করে, রাণুর বিবাহ পর্যন্ত। কিন্তু, এই আট বছর সময় রাণু'র জীবনে এবং কবি'র জীবনে কেটে দিল গভীর দাগ। কবি'র শিলং ভ্রমণ, এমন কি কবি'র জীবনের অন্যান্য অনেক ঘটনা আছে, যার মধ্যে এই ছোট্ট বন্ধুটির উল্লেখ অপরিহার্য। আবার কবিকে বাদ দিয়ে, রাণুর জীবনী লেখাও বোধ হয় অসম্ভব।

কবির দ্বিতীয় শিলং ভ্রমণ ১৯২৩-এ। সঙ্গে স্বয়ং রাণু। বাষট্টি বছরের রবীন্দ্রনাথ আর সতের বছরের পূর্ণ যুবতী রাণু। ছিলেন ব্রুকসাইডেরই পাশের আর একটি বাড়িতে— জিৎভূমি। 'শেষের কবিতা' তখন কবির কল্পনায়। এই সময়ে কবি শিলং-এ ছিলেন প্রায় চল্লিশ দিন, জিৎভূমি বাড়িতে। এগারো বছরের শিশু, সে কিনা রবীন্দ্রনাথের মত এক ব্যক্তিত্বকে বলে, আমি আপনার গল্পগুচ্ছের সব গল্পগুলো পড়েছি আর বুঝতে পেরেছি। এই রবিবাবু ধীরে ধীরে রবিদাদা হয়ে কি ভাবে ভানুদাদা হয়ে গেলেন, তাও এক উপাখ্যান। বহু লেখালেখি, বহু শব্দ বিনিময় এর পর কি ভাবে ভানুদাদা এল, তা কবির রাণুকে লেখা চিঠিতেই পরিস্কার। এক জায়গায় তিনি লিখছেন— "তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করেছ 'রবিদাদা' না বলে আমাকে আর একটা কোনও নামে সম্ভাষণ করতে পার কিনা।" দু-একখানি চিঠির পরেই একেবারে সোজাসুজি কবি লিখছেন, "আচ্ছা বেশ, রাজি। ভানুদাদা নামই বহাল হল। এ নামে আজ পর্যন্ত আমাকে কেউ ডাকেনি, আর কেউ যদি ডাকে তবে তার উত্তর দেবনা।"

রবীন্দ্রনাথের তিনবার শিলং ভ্রমণকে যদি তিনটি পর্য্যায়-এ ভাগ করা যায়। তা হলে দেখতে পাওয়া যাবে, প্রথম পর্য্যায়ের ভ্রমণ অর্থাৎ ১৯১৯ সালের ভ্রমণকে নিছকই 'চেঞ্জ' বা হাওয়া বদল বলা যেতে পারে। বিশেষ কোনও উল্লেখযোগ্য ঘটনা সেবারের ভ্রমণ-এ পরিলক্ষিত হয়না। চার বছর পরের শিলং ভ্রমণ, অর্থাৎ, অর্থাৎ ১৯২৩-এর ভ্রমণ ছিল উল্লেখযোগ্য এবং বৈচিত্র্যময়। কারণ, এবারে ভ্রমণ-এ কবির ভ্রমণসঙ্গী ছিলেন স্বয়ং রাণু অধিকারী। ছিলেন জিৎভূমিতে প্রায় দেড়মাস সময়। আরো চার বছর পর অর্থায ১৯২৭ সালে কবির তৃতীয় শিলং ভ্রমণ অপেক্ষাকৃত গতানুগতিক এবং বৈচিত্র্যহীন। পূর্ববর্তী ১৯২৩-এর শিলং ভ্রমণ থেকে কবির এই তৃতীয় ১৯২৭-এর শিলং ভ্রমণে ছিলেন না রাণু। ১৯২৩-এর মিস্ রাণু অধিকারী এখন মিসেস রাণু মুখোপাধ্যায়। যেটা উল্লেখযোগ্য, সেটা হল, এই তৃতীয় শিলং ভ্রমণকে কেন্দ্র করেই সৃষ্টি হয়েছিল কবির ভিন্ন স্বাদের উপন্যাস 'মিতা', যা পরবর্তী কালে প্রকাশিত হয় 'শেষের কবিতা' নামে। এই চার বছরের মধ্যে কবির জীবনে বয়ে গেছে অনেক ঝড়, কবির মন সহ্য করেছে অনেক যাতনা।

সে যাই হোক, শৈল শহর শিলং পৃথিবীর সমস্ত ভ্রমণ-পিপাসু মানুষের মনে এক বিশেষ জায়গায় থাকবে, কারণ, এখানকার অতুলনীয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ছাড়াও, এখানে ঘুরে বেরিয়েছিলেন এক সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী, যার জীবনে

মানুষের উর্ধ্বে আর কিছু ছিলনা। স্বামী বিবেকানন্দ শিলং-এ এসেছিলেন ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণ তথা বেদান্তের উদার বাণী মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে। স্বামীজি এখানে কোনও ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্য নিয়ে আসেননি। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন মানবকল্যাণকামী। এখানেও তিনি এসেছিলেন সমগ্র মানবজাতির উন্নয়নকল্পে। জাতি, ধর্মের উর্ধ্বে গিয়ে স্বামীজি এই কর্মযজ্ঞের ইঙ্গিত দিয়ে আসেন শিলং পাহাড়ে।

রবীন্দ্রনাথ শিলং পাহাড়ে এসেছিলেন তিনবার। প্রথম শিলং আসা ১৯১৯-এ। সঙ্গী ছিলেন রথীন্দ্রনাথ, প্রতিমা দেবী, দিনেন্দ্রনাথ, কমলা দেবী এবং ভৃত্য সাধুচরণ। শিলং পৌঁছেই কবি দীর্ঘ পত্রে পৌঁছ সংবাদ লিখেছিলেন রাণুকে। রাণুর বয়স তখন তেরো। এরপর কবি শিলং এলেন ১৯২৩-এ। সফরসঙ্গী - রাণু। কবির এ বারের শিলং ভ্রমণ ছিল ঘটনা বহুল কারণ, কবির এই ভ্রমণকালে শিলংবাসী বহুমানুষ প্রত্যক্ষ করেছেন, দুজন অসমবয়সী বন্ধু কিভাবে মনের ভাব বিনিময় করতে পারেন। একজন ষাট ছুঁই ছুঁই প্রবীণ, আর একজন তেরো বছরের বালিকা।

কবির তৃতীয় শিলংযাত্রা ১৯২৭-এ। কবির এই শিলং ভ্রমণ বোধ হয় নিজের কাছেই ব্যতিক্রমী ছিল— কারণ এখান থেকে তিনি রাণুকে লিখলেন, "রাণু, শিলঙে এসে পৌঁছেছি। কিন্তু, এ আর এক শিলং।" এ শিলং আর এক শিলং হতে বাধ্য, কারণ কবি স্বয়ং এই তৃতীয় শিলং ভ্রমণে কারুর একটা অনুপস্থিতি অনুভব করছেন। তিনি হচ্ছেন রাণু।

বিষাদ না থাকলে পৃথিবীর বেশির ভাগ শিল্প কমই সৃষ্টি হত না। কবি'র জীবনে দুঃখ না থাকলে হয়তো আমরা তাঁর অনেক মধুর সৃষ্টি থেকে বঞ্চিত হতাম। শিলং কবির জীবনের সাথে একাকার হয়ে আছে, এবং থাকবে। আমরা পাঠককুল, কবির সৃষ্টির সাথে শিলং পাহাড় এবং শিলং-এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যকে আমাদের অন্তরে বেঁধে রাখব। আমরা যতবার শিলং পাহাড়ে যাব, ততবার দুজন প্রকৃত মানুষের স্পর্শ এখানকার গাছে, ফুলে, মাটিতে সর্বদা অনুভব করব।

ধর্ম-প্রকৃতি-মানুষ

তপন কুমার দাস

একজন ধার্মিক পণ্ডিত বলেছিলেন, ঈশ্বর যদি না থাকত তবে মানুষকেই ঈশ্বর সৃষ্টি করতে হত। আর একজন দার্শনিক বলেছিলেন, যিনি ঈশ্বরকে কল্পনা করেছেন তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান ব্যক্তি। এই দুই ভাবনা থেকেই জানা যাচ্ছে ঈশ্বর, ধর্ম মানুষের প্রয়োজনের সাথে সম্পর্কিত।

কিসের প্রয়োজন? অতীতে প্রকৃতির ঘটনাবলীর কার্য-কারণ মানুষ জানত না, কাজেই সব কার্যের পিছনে ঈশ্বরকে বসিয়ে দিলেই তার কারণ মিলে যেত। দ্বিতীয়ত মানুষের ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করার জন্য একজন অসীম ক্ষমতাসম্পন্নের কাছে প্রার্থনা করার জন্য ঈশ্বর প্রয়োজন হয়েছিল। তৃতীয়ত মৃত্যুর পরেও বেঁচে থাকার ইচ্ছা পূরণের জন্য ঈশ্বরের গড়া স্বর্গের প্রয়োজন হয়েছিল।

.কিন্তু মানুষ ক্রমশ প্রকৃতির ধর্ম আবিষ্কার করল। পরীক্ষা-নিরীক্ষা-অনুধাবন ক্রমশ প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর ব্যাখ্যায় প্রয়োগ হল। নিত্য নতুন আবিষ্কারে রহস্য উন্মোচিত হতে থাকল। ঝড়, ভূমিকম্প, বন্যা, নদী, ঝরনা কোনো কিছুর পিছনেই একটা করে দেবতা কল্পনার প্রয়োজন থাকল না।

আর ক্ষমতা— হাতের ক্ষমতা বাড়াল যন্ত্র, পায়ের ক্ষমতা পরিবহনের উপর নির্ভর করে বৃদ্ধি পেল, মাথার ক্ষমতা বাড়াল কম্পিউটার। কিন্তু এত শক্তি সঞ্চয় করেও অনেক অক্ষমতার সামনে ঈশ্বর কল্পনা বন্ধ হল না। স্বর্গ নামক শিশুসুলভ কল্পনার অবসান হল না। বিংশ শতাব্দী অতিক্রম করেও, আশ্চর্য হতে হয় মানুষ আজও সেই আদিম কল্পনাকে ত্যাগ করতে পারে নি। তাই বুদ্ধিমান মানুষের ঈশ্বর প্রকল্প আজও সজীব।

যুক্তি দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে প্রকৃতির সত্যকে আবিষ্কার করেও এক শ্রেণীর মানুষ হীন স্বার্থে ধর্মকে অবলম্বন করার ইন্ধন সৃষ্টি করে চলেছে। তারা কেবল ধর্ম বিশ্বাসকেই সামনে আনে না, গোটা সমাজকেই সেই প্রাচীন অচল ধর্মীয় নিয়ম কানুনে আবদ্ধ করতে চায়। আজকের আধুনিক চিন্তাকে অতীতের মৌলবাদে ফিরিয়ে নিতে চায়।

এর পাশাপাশি প্রকৃতিকে, সমাজকে, মানুষকে চেনাবার যে চিন্তাপ্রবাহ, তারও বিকাশ ঘটেছে। নানা সামাজিক আন্দোলন সংগঠিত হয়েছে। বিভ্রান্তির পিছনে না ছুটে সমাজকে বদলাবার আহ্বান এসেছে। ইউরোপে নবজাগরণের ঢেউ ছড়িয়ে পড়েছে। মার্কসবাদের বাস্তব জীবন জিজ্ঞাসায় মানুষ উদ্বুদ্ধ হয়েছে। এই সামাজিক প্রবাহে মানুষের মন থেকে অলীক কল্পনা ক্রমশ আবছা হয়ে হারিয়ে যেতে শুরু করেছে।

মৌলবাদী ধারা আর প্রগতিশীল ধারা এক দ্বন্দ্বমান অবস্থার মাঝখানে বসে দাঁড়িয়েছে।

বাংলার চিন্তাধারায় কুসংস্কার, ধর্মান্ধতা, গোঁড়ামীর স্থান ছিল না। ঊনবিংশ শতকের নবজাগরণ আর বিংশ শতকের বামপন্থী আন্দোলনের ঢেউ এক মুক্তচিন্তার জোয়ার সৃষ্টি করেছিল।

কিন্তু এখন যখন দেখা যায় হাজার হাজার যুবক-যুবতী বাঁক কাঁধে নিয়ে তারকেশ্বরে জল দিতে চলেছে, মোবাইল হাতে যুবক-যুবতী কব্জিতে নোংড়াসুতোয় ভরিয়ে তুলেছে তখন বোঝা যায় কোথাও মানসিক বিপর্যয় ঘটেছে। বামপন্থী আন্দোলনে অংশীদার হলে যে বামপন্থী চিন্তায় সমৃদ্ধ হওয়া প্রয়োজন তা বর্জিত হয়েছে। তাই সমাজবদলের পতাকা হাতে নিয়েও তারা প্রার্থনার জন্য দেবতাকে বেছে নেয়। মানসিক দৈন্যের এটা একটা দিক।

কাজেই সামাজিক আন্দোলনের সাথে সাথে মুক্তচিন্তা, চিন্তা মুক্তির চর্চা না করলে তা ধর্মান্ধতাকে আটকাতে পারে না।

আর ইসলামের নামে যে ধর্মান্ধতা তা এক ধোঁয়াশার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে। সমাজ চলার যে বাস্তব রাস্তা— আর্থ-সামাজিক সমস্যার সমাধানের রাস্তা অলৌকিক বেহেস্তের পথ বর্জনের ভাবনা তাকে গ্রহণ করতে না চাওয়ার ফলেই বিক্ষিপ্ত ধর্মান্ধতার জন্ম হচ্ছে।

বুদ্ধিমান যে মানুষটি ঈশ্বর-প্রকল্প গড়ে মানুষকে সেদিনের অজ্ঞতার সামনে একটা উত্তর জানিয়েছিলেন, তাঁর সেই প্রকল্প মানুষের জ্ঞানের সামনে অন্ধত্বের রূপ নিয়ে সব গুলিয়ে দিচ্ছে। ঈশ্বরকে খুঁজতে গিয়ে কোথাও যখন পাওয়া যাচ্ছে না তখন বিশ্বাসকেই হাতিয়ার করে সব জায়গার ঈশ্বর' আছে বলে এক বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা হচ্ছে।

কাজেই এই অলীক ঈশ্বরকে বর্জন করে ঈশ্বর কেন্দ্রিক ধর্মকে ত্যাগ করে মানুষকে ভালোবাসার ধর্ম প্রকৃতিকে সংরক্ষণের ধর্ম, নিজের

চিন্তাকে মুক্ত উন্নত করায় ধর্ম গ্রহণের পথে অগ্রসর হওয়াই মানুষ ও সভ্যতার পথ। সমস্ত আন্দোলনের লক্ষ্যও হোক এই পথ। ধর্মমুক্ত পৃথিবী হয়ে উঠুক এক সাম্য, প্রীতি, সমৃদ্ধির পৃথিবী।

পিকনিক—২০ ফেব্রুয়ারি ২০২১, শনিবার

স্নেহাংশু চাকদার

২০ ফেব্রুয়ারি ২০২১, শনিবার সংস্থার পক্ষ থেকে পিকনিকের আয়োজন করা হয়। বজবজ-এর সন্নিকটে নোদাখালী, রায়পুর গঙ্গা নদীর ধারে বাগানবাড়ি, 'পুষ্পালয়ে' পিকনিক অনুষ্ঠিত হয়। তিনতলা বাড়ি, সঙ্গে প্রচুর গাছপালা, ফুলের বাগান, গঙ্গার ধারে বসার অনেক জায়গা, মনোরম পরিবেশ।

সংস্থার সদস্য, শুভানুধ্যায়ী, বাসের স্টাফসহ মোট ৭৪ জন সদস্য পিকনিকে অংশগ্রহণ করেন। তার মধ্যে ২/৩ ভাগ মহিলা, ৭৫ উর্দ্ধ ২০-২২ জন। ছোট বাচ্চারাও ছিল। অনেকে শারীরিকভাবে অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও পিকনিকের আনন্দে মেতে ওঠেন।

সকাল ৯ টায় বেথুন ইন্সটিটিউটের সম্মুখ থেকে ২টি বাস ছাড়া হয় এবং সকাল ১১ টায় গন্তব্যস্থানে পৌছায়। বাস থেকে নেমে সকলে টিফিন গ্রহণের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে। অংশগ্রহণকারী সদস্যগণ স্বরচিত কবিতা, আবৃত্তি, সঙ্গীত, হাস্য-কৌতুক এবং বিভিন্ন ধরনের খেলার ব্যবস্থা করেন। এসমস্ত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন পেলব মুখার্জী, সরস্বতী সরকার, শিলাদিত্য মৈত্র, রঞ্জিত সরকার, নারায়ণ ঘোষ, শিখা ঘোষ, আন্না ভদ্র, তুহীন দে, অয়ন ঘোষ, সর্বাণী হালদার, মিতা দাস, জয়শ্রী গুপ্ত প্রমুখ।

পিকনিকের দায়িত্বে ছিলেন নরায়ণ দাস, নারায়ণ ঘোষ ও উমা সাহা। বাসের ব্যবস্থা করেন নারায়ণ দাস। নারায়ণ দাস-এর সার্বিক সহযোগিতায় সমস্ত অনুষ্ঠানটি উপভোগ্য হয়।

অংশগ্রহণকারী সকল সদস্য-সদস্যাবৃন্দ সুষ্ঠভাবে আয়োজনের ব্যবস্থা করার জন্য সংস্থার প্রশংসা করেন।

প্রবীণবার্তা

সম্পাদকীয় বিভাগ

'প্রবীণবার্তা' পত্রিকার জন্য সকলকে গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ বা ভ্রমণ বিষয়ক লেখা পাঠাতে অনুরোধ জানাই। কবিতা ৩০ লাইনের মধ্যে এবং অন্যান্য লেখা ১৫০ শব্দের মধ্যে পাঠাবেন। হাতে লিখে, ডিটিপি করে কিংবা টাইপ করে লেখা পাঠাতে পারেন। প্রতি পৃষ্ঠার একদিকে লিখবেন। মূল পাণ্ডুলিপির এক কপি নিজের কাছে রাখবেন। প্রেরিত রচনা সম্পূর্ণ মৌলিক হওয়া বাঞ্ছনীয়। ইতিপূর্বে প্রকাশিত কোনো লেখা পাঠাবেন না। আপনার লেখা ডাকযোগে, ক্যুরিয়ারে যে কোনও মাধ্যমে পাঠাতে পারেন অথবা সরাসরি আমাদের অফিসে এসে জমা দিতে পারেন। যে-কোনও রচনা মনোনয়নের ক্ষেত্রে সম্পাদকমণ্ডলীর সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত।

—ঃ বিজ্ঞপ্তি ঃ—

ডাঃ নর্মান বেথুন ক্লিনিক

জয় ইন্ডাস্ট্রিয়াল কো-অপারেটিভ ভবন

৯০/১, পি. জি. এইচ শাহ রোড,

কলকাতা - ৭০০ ০৯৫

যোগাযোগ - ০৩৩-২৪৭৩ ৯৬৪২ /

৯৬৭৪৫৫৩৪৭৭ / ৯৪৩৩৭৯৭০৫৮

সুলভে আধুনিক ফিজিওথেরাপী -

ছুটির দিন ব্যতীত সপ্তাহের

প্রতিদিন - সকাল ১০.৩০ থেকে সন্ধ্যা ৭টা।

- ডাক্তার চেম্বার -

অ্যালোপাথি / হোমিওপ্যাথি,

আকুপাংচার

অর্থোপেডিক	ঃ মঙ্গলবার	- সন্ধ্যা ৬টা
	ঃ শনিবার	- বেলা ১টা
হোমিওপ্যাথ	ঃ বুধবার	- বিকাল ৫টা
	ঃ শুক্রবার	- বিকাল ৪টা
	ঃ শনিবার	- বেলা ১২টা

- বিজ্ঞাপন -

জনস্বাস্থ্য পরিষেবায় ৭৮ বছর

পিপলস্ রিলিফ কমিটি (পঃ বঃ)

২৬সি, দিলখুসা স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০১৭

দুরাভায ঃ ২২৮০ ৪৯৪০ / ৯৪৪৪

যাদবপুর কেন্দ্র

বকুল দত্ত স্মৃতি ভবন

৩/৮০, চিত্তরঞ্জন কলোনি, রাজা এস.সি.মল্লিক রোড,

যাদবপুর, কলকাতা - ৭০০ ০৩২

বাস স্টপ ঃ অন্নপূর্ণা, 'একতা হাইটস' এর পাশে

দূরভাষ-২৪২৫ ৪৪৫৪ (সন্ধ্যা ৬-৭টা)

কম খরচে

রোগনির্ণয়ে রক্ত পরীক্ষা

সোমবার থেকে শনিবার (সকাল ৮টা-১১টা)

স্পেশালিষ্ট ক্লিনিক

পরামর্শ ১০০ টাকা + পি. আর. সি. সহায়তা ১০ টাকা

১) ডঃ উৎপল ব্যানার্জী (অর্থোপেডিক) এম.এস, ডি.এন.বি (অর্থো)

প্রতি মাসের ২য়/৪র্থ শুক্রবার সন্ধ্যা ৬টা

২) ডঃ প্রদ্যুৎ শূর এম.ডি. (গাইনোকলজিস্ট) বুধবার, সন্ধ্যে ৭টা

৩) ডঃ বি. বাউর-এম.ডি. (জেনারেল মেডিসিন)-বুধবার, ৩টা

৪) ডঃ সৌম্য চ্যাটার্জি এম. ডি. (নিউরো-সাইকিয়াট্রিস্ট ও নেশা মুক্তি) শুক্রবার, ৮টা

৫) ডঃ মৌমিতা চ্যাটার্জী এম.ডি. (জেনারেল অ্যান্ড চেষ্ট মেডিসিন), সোমবার, সন্ধ্যে ৭টা

আবেদন ____________

বিধান পল্লিতে নির্মিয়মান বৃদ্ধাবাসের জন্য অর্থ সাহায্য করুন।

Published by Dipesh Mitra on behalf of Bethune Institute of Geriatrics Research & Rehabilitation Centre Ph. :033 2473 9642, 9674553477 and printed at Monalisa Printers, D/26 Katjunagar, Kolkata - 700 032 and Published at 392A, Prince Anwar Shah Road, Kolkata - 700 045. Editor - Sri Dipesh Mitra.
E-mail- bethune geriatrics@gmail.com. Website : bethunegeriatric.in